একটি জাতিকে হত্যা

আবদুর রউফ চৌধুর

এক: বাঙালি নিধন পর্ব

মা নেমেছেন সন্তান বাঁচাতে।

৭০-এর শরতে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছাসে ভোলা-হাতিয়া-সন্দ্বীপসহ যে বিপর্যয় এনেছিল পূর্ব-বঙ্গে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বর্তমানে; এদেশ এখন মৃত্যু ও দুর্গতির সম্মুখীন। এবার কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; মানুষ যে মানুষের প্রতি কত অমানসিক ব্যবহার করতে পারে তারই নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। পশ্চিম-পকিস্তান দ্বারা বাংলার ওপর চলছে হত্যাকাণ্ড। এটি আরও বেদনাদায়ক এজন্যে যে, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদি-বা যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হত। শুরু থেকেই পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র, তবু বোধ হয় পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলকে একত্রে ধরে রাখা সম্ভব হত; আর ৭০ মিলিয়ন বাঙালিকে শক্তির বলে দাবিয়ে রাখার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানি পাঞ্জাবি-নিয়ন্ত্রিত সামরিকবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন হত না, যদি সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব-বঙ্গের প্রতি খেয়াল রাখতেন, বাঙালির চাহিদা মেটানোর জন্য মনোযোগী হতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালি নিরস্ত্র জনতার উপর সৈনবাহিনীর আক্রমণ সামরিক বর্বরতার ক্ষেত্রে সর্বকালের দৃষ্টান্তকে ম্লান করছে। পূর্ব-বাংলার সর্বস্তর মানুষের জীবনে ভীতিসঞ্চার করে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালির আনুগত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই বর্বরতা শুরু হয়েছে। এ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল ও আত্মঘাতী; বিরামহীন-বিরতীহীন আঘাত বা জোর চালিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না।

১৯৪৭ সালের আগস্টে, রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এলেও বঙ্গ নামের ভূখণ্ড বিভক্ত হয় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গে থেকে যায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা, প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা, চারটি থানা ছাড়া সিলেটও। এছাড়া নদীয়া, যশোর, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা অঞ্চলকে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। এসব অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত পূর্ব-বঙ্গের মানুষ অনেক সম্ভব-অসম্ভবের আশা বুক বেঁধে জিন্নাহ যে উগ্রসাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র হাতে নিয়ে মুসলিম উৎপীরণের মিথ্যা অভিযোগে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টিলগ্ন থেকে একটি দ্বিধাবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এই দ্বিধাবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত লাভ করার কারণ হচ্ছে– একদিকে যেমন এই নতুন রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বাস করছে, ভৌগোলিক ব্যবধান প্রায় এক হাজার মাইল, তেমনি সংস্কৃতির দিক থেকেও হাজার হাজার মাইল দূরত্ব। পূর্ব-বঙ্গ ছাড়া পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশই পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত, ভৌগলিক সীমারেখার দিক থেকে একক; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিম অঞ্চল থেকে হাজার মাইল দূরত্বেই শুধু অবস্থিত নয়, মাঝখানে ভারত রাষ্ট্রও; ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা–

স্থল, জল, বিমান পথে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির দিক থেকেও দ্বিধাবিভক্ত; করাণ– পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশ প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীর গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবনপ্রণালী, ধ্যানধারণা, আচারাচরণ চৌদ্দ আনাই এক; কিন্তু বঙ্গের সঙ্গে পনেরো আনাই ভিন্ন; ধর্মীয় বিশ্বাসে শুধু এক সূত্রে গাঁথা। তদুপরি দু'অঞ্চলের মধ্যে দুস্তর আর্থিক ব্যবধানও বিদ্যমান। এগুলোকে অসহনীয় করে তুলেছে পূর্ব-বঙ্গের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রভুত্ব পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত ও ষড়যন্ত্র মূলক কতগুলো নীতিরীতি– রাজনৈতিক কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক শোষণ। পাট ও চা রপ্তানীর মাধ্যমে পূর্ব-বঙ্গ যা উপার্যন করছে এ পাকিস্তানের বাজেটের চাহিদায় ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ৭৫ভাগ। পূর্ব-অঞ্চলের জনসংখ্যা যদিও বেশি তথাপি সামরিক ও বেসামরিক খাতে পাঁচভাগের চারভাগই ব্যয় করা হচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া হয় বছরের পর বছর, ঢাকনা শক্ত করে স্ক্রু-বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে বাঙালির অসন্তোষ বেরিয়ে আসতে না পারে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের ধারণা পরিত্যাগ করে ঝুঁকেছে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের দিকে। বাঙালি জীবন সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে শুরু করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাঙালি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২), স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন (১৯৫৪), জনসংখ্যাভিত্তিক আইন পরিষদ গঠনের দাবী (১৯৫৮-১৯৬০), অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবী (১৯৬০-১৯৬৫) ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন (১৯৬৮), গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯) প্রকাশ করে এসেছে।

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বাঙালি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে ১৯৫৪ সালে সংঘটিত প্রাদেশিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল আলাদা। নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ৩১০-সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে ২৩৭টি মুসলিম আসনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫৩ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল– আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত নেতা ছিলেন– মওলানী ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী। ২১-দফার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নেমেছিল, আর তাদের ২১-দফার প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল– বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তন ও শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রর্বতন করা, 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ আইনসহ সকল কালাকানুন বিলোপ করা, প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাবিক ভাবে কমানো, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে প্রথমে একটি ছাত্রাবাসে এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান রূপে গঠন করা, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা, ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা শহীদ হন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান করা, সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আইন বাতিল করা ও বিনা বিচারে আটক বন্দি মুক্তি দেওয়া, এবং সর্বোপরি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন আদায় করা; এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের অধীনে রেখে অন্যান্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনা এবং সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদরদপ্তর পূর্ব-বঙ্গে স্থাপনের ব্যবস্থা করা, আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিসিয়াতে রূপান্তরিত করা এবং পূর্ব-বঙ্গে অস্ত্রনিমার্ণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। ২১-দফার বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কারণ এই ইস্তাহার জনগণের দাবীদাওয়া ও আবেগানুভূতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি করা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগ কোনোরকম নির্বাচনী ওয়াদা ছাড়াই নির্বাচনে নেমে পড়েছিল, তাই ৩১০টি আসনের মধ্যে মাত্র ন'টিতে মুসলিম লীগ, ২২৩টিতে যুক্তফ্রন্ট, পাঁচটিতে অন্যান্য দল আর ৭৩টি ঐক্যফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন ইত্যাদি দলের সমন্বয়ে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নানা দ্বিপাক্ষিক গোপন সমঝোতা গড়ে তুলে '৭০-এর ডিসেম্বর মাসে ইলেকশনের ডাক দেয়। ইলেকশনের মাধ্যমে যখন স্ক্রু একটু ঢিলা করা হয়, তখনই উঁকি দিয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী সম্বলিত ছয়দফার পক্ষে গণভোট হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ নির্বাচন অভিহিত করেন। দাবী তুলেন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের– অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। জনসাধারণ একে পূর্ণ সমর্থন দেয়; জনগণ জানে এর ফলে পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোতে আঘাত পড়বে– পূর্ব-বঙ্গের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের সার্বিক আধিপত্য ও আর্থিক বরাদ্দলাভের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার একেবারে ভেঙে যাবে। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর '৭০ নিখিল পাকিস্তান জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন।

The political programme of Sheikh Mujib's Awami League, over-whelminly endorsed by the people of East Pakistan in the recent elections, sought to correct these disparities by transferring control over economic

> policy from the Central Government to the Provinces. The response of Yahya Khan's Government was to unleash a resign of terror whose full dimension are only gradually becoming known.[1]

'৭০-এর ইলেকশনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বঙ্গের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে, অন্য দুটি আসনে নুরুল আমিন ও রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন; তবে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবিরা অনুমান করেছিলেন যে, কাইয়ুমের মুসলীমলীগ-৭০, দাওলতয়ানা-৪০, ভূট্টো-২৫, জাতীয় আওয়মীলীগ-৩৫ ও মুজিব আওয়ামী লীগ-৮০টি আসন পাবে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ-এর (ওয়ালী) একটি আসন ছাড়া সব আসনে আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপলস পার্টি, বেলুচিস্তান প্রদেশে ন্যাপ (ওয়ালী) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ন্যাপ (ওয়ালী) ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (থানভী) কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো অবস্থা হয়। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; এতে পশ্চিম-পাকিস্তানের সার্বিক আধিপত্য ও সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার– এই দুটি স্বার্থে আঘাত পড়ে। সামরিক ক্ষমতার বেসামরিক সরকার গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। গণতান্ত্রিক সুযোগকে ঠেকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষক ও শাষকগোষ্ঠী মিলিতভাবে সামরিকপন্থায় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা রচনা করতে উদ্যোগী হয়।

> The military government, although it allowed elections, never indented to hand over real power to the people. Their calculation was that once election were held different parties would share the seats. There would be political chaos in the country and they would be able to discredit politicians once again to perpetuate their rule. But the election results shattered their plan. The promise to transfer power which Yahya Khan made soon after he came to power, as only a caretaker government, was a promise with a hidden meaning.[2]

নির্বাচনের পর পূর্ব-বঙ্গে সবকিছু বদলে যায়, যা ছিল অস্পষ্ট ইচ্ছা তা ধারণ করে সুস্পষ্ট এক ইচ্ছায়– ছয়দফার পরিবর্তনে একদফা– রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং জাতীর মুক্তি। বাঙালি বুঝতে পারে– নির্বাচনের রায়কে যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পূর্ব-বঙ্গে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করা হবে। দীর্ঘদিনের জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার এই তো সময়। বাঙালি প্রস্তুত। অন্যদিকে মাওলানা মওদুদী ও গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে বিবৃতি দেয়; আর পশ্চিম-পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নির্বাচনে জয়ী শেখ মজিবুরের নীচে অবস্থান নিতে নারাজ প্রকাশ করে। গোপন জোট পাকাতে শুরু করে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে; যদিও ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে ১১ জানুয়ারি '৭১ বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুরকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করেছিল। আস্তে আস্তে শুরু হয় ভূট্টো-ইয়াহিয়া ও পাকিস্তানের ক্ষমতালিপ্সু সামরিক অফিসারের মিলিত ষড়যন্ত্র। ঠিক করে, তারা একজন বাঙালিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেবেন না। কতগুলো রাজনৈতিক নাটকের মহড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়, শক্তি প্রয়োগে পূর্ব-বঙ্গকে ধরে রাখার। সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য শুধু সময়ের প্রয়োজন!

> ...from the election time, election results were in, Bhutto began trying to deny to the East the right to get the kind of constitution it wanted. Bhutto, a feudal landlord and former foreign minister with a brilliant but opportunistic career, had won in the West on socialistic promises to the poor. His obstructive manoeuvers against Rahman served the interests of the Western elite, however, rather than poor.[3]

সময় প্রয়োজন তাই সময় বের করে নিতে হবে, যেকোনো ভাবে। সময়ও এসে যায়– ভূট্টো যখন নতুন সংসদে অংশগ্রহণ নিতে অস্বীকার করে তখন ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক শাসক জানে ছয়দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করলে তাদের কোনো লাভ হবে না– এরকম আপোষরফা মানেই সামরিক শক্তির আত্মহত্যার নামান্তর। অন্যদিকে ছয়দফার সংশোধনে সম্মত না হলে পরিষদ অধিবেশনের কোনো সম্ভাবনা নেই; তাই ১লা মার্চ ইয়াহিয়া, ১টা পাঁচ মিনিটে, এক বেতার ঘোষণায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব প্রকাশ

---

1 The Sunday Times, 18 April '71.
2 The Sunday Times, 18 April '71.
3 The Evening Star [Washington], 8 July '71.

করে। জাতীয় পরিষদ বৈঠক বাতিলের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব-বঙ্গে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে, স্বতস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ। এ অপ্রত্যাশিত ঘোষণার প্রেক্ষিতেই শেখ মুজিবর রহমান হরতালের ডাক দেন। আওয়ামী লীগের অসামান্য পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান পরিণত হয় অসহযোগ আন্দোলনে। পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষ দলে দলে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ থেকে গুলিস্তান, গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত জনতার মিছিলে স্বাধীনতার আওয়াজ ধ্বনিপ্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাঙালি জনতার মুখে একই শ্লোগান, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে বাঙালি জনতা বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলে, আর এখান থেকেই শুরু হয় পূর্ণ স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ। ২রা মার্চ আবারও রাজধানীতে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। এই হরতাল পালনকালে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে, এতে দু'জন মৃত্যু বরণ করে ও বেশ কিছু লোক আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভায় গৃহীত হয় স্বাধীনতার প্রস্তাব। ছাত্ররা বাংলাদেশের একটি মানচিত্র আঁকা পতাকা বহন করে শুভযাত্রা করে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত একটানা ১২-ঘন্টার কার্ফু জারি করা হয়। ৩রা মার্চে পানি, প্রেস, বিদ্যুৎ হরতালের বাইরে রেখে অফিস-আদালত বন্ধের নির্দেশ আসে আওয়ামী লীগ থেকে। টাকা লেনদেনের জন্য ব্যাংকগুলো শুধু খোলা রাখা হয়, আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত। বিকালে, পল্টন ময়দানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষিত হয়। ৫৬ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম– বাংলাদেশ, জাতীয় সঙ্গীত– আমার সোনার বাংলা, আর দেশের সর্বাধিনায়ক– শেখ মুজিবর রহমান।

৪ঠা মার্চ বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও অবাঙালির মাঝে শুরু হয় দাঙ্গা। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে, ঢাকায় আটজন বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যরা এবং চট্টগ্রামে বাঙালি আর অবাঙালির মধ্যকার সংর্ঘষের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। নিষ্ঠুর পাকিস্তানি সৈন্যরা টঙ্গীতে দু'ব্যক্তিকে হত্যা করে। বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। হরতাল, সংগ্রাম, গুলি আর মানুষ মারার খেলা। মুক্তি সংগ্রাম। শুরু হয় অঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন; এই আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ'-এর সমগ্র প্রশাসন বিভাগ কার্যত– এক 'বিকল্প সরকার'-এ পরিণত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে দুটি আইন– একটি মার্শাল'ল রেগুলেশন আর অপরটি আওয়ামী লীগ রেগুলেশন। সত্যিকার অর্থে দেশ চলছে আওয়ামী লীগের নির্ধারীত আইন অনুযায়ী; কাজেই ইয়াহিয়ার উচিত শেখ মুজিবরের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় ফিরে আসা, অন্যথায় পূর্বাঞ্চল চলে যাবে আপন পথে; তবুও কি হুঁশ হচ্ছে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো মদ্যপায়ীদের। আসলে কিন্তু আকস্মিক ঘটনা মোটেই না– এ একটি পূর্ব-পরিকল্পিত ঘটনা। সামরিক জান্তা চাচ্ছে বাঙালিকে চূড়ন্ত আঘাতে হত্যা করতে। সমর প্রস্তুতি। সুপরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে হত্যা করা ছাড়া এ অন্য কিছু না।

> ...the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheikh Mujib win a single measure of autonomy for East Pakistan.[4]

'৭১-এর পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য না, বরং অবশিষ্ট আয়োজন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে শান্তির আলোচনার প্রস্তাব দেয়। শন্তির আড়ালে অশান্তির জাল বিস্তার করাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। ৬ই মার্চ, জাতীয় রেডিও-র মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করে যে, জাতীয় পরিষদের বৈঠক আগামী ২৫শে মার্চ শুরু হবে। হুমকির সুরে আরও বলে, 'আমি সেনাবাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও নিরাপত্তা নষ্ট হতে দেব না।' একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লে. জেনারেল টিক্কা খানাকে নিয়োগ করে পূর্ব-পাকিস্তানের গভার্ণর হিসাবে; এ থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, ইয়াহিয়া শক্তির বলে শাসন করতে চাচ্ছে। এ বুঝতে পেরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান লাখ মানুষের সমাবেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর এ উদ্যোগকে সরকারীভাবে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তে সামরিক সরকার ঢাকায় নিয়ে আসে টিক্কা খানকে বিকেল ৩.৪০ মিনিটে। শোসকগোষ্ঠী সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের ঘোষণায় বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বিশাল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষণা হয়ে ওঠে বাঙালির কাছে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ। ৮ই মার্চ সকালে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণটি রেডিও-পাকিস্তান-ঢাকা থেকে পূণঃপ্রচার করা হয়। একই সঙ্গে 'রেডিও পাকিস্তান' ও 'পাকিস্তান টেলিভিশন'-এর নাম বদলিয়ে 'ঢাকা বেতার' ও 'ঢাকা টেলিভিশন' নামে প্রচার শুরু করে। লন্ডনেও দশ হাজার বাঙালির সমাবেশে 'বাংলাদেশ'-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর জয়ধ্বনি ওঠে। স্বাধীনতার ডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশে প্রবাসে বাঙালির মাধ্যমে; বাঙালি চায় এমন একটি দেশ, যেখানে থাকবে না আর– অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অভিশাপ– অসুন্দরের অবসান ঘটিয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর একটি সমাজতান্ত্রিক ও শোষনহীন দেশ কামনা করছে। বাংলাকে আর কোনো শক্তিই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারবে না। পশ্চিম-পাকিস্তানে জামাইত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি মাহমুদ যাই ঘোষণা করেন না কেন, বাংলার মাটি-পানি-আলো-বাতাসে লালিত-পালিত মানুষগুলোকে ঠেকানো যাবে না। দেশের বিভিন্ন শহরে অস্ত্রবিক্রির দোকান ও থানা থেকে স্বাধীনতাকামী মানুষ অস্ত্রসংগ্রহ করতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার

[4] The New York Times, 28 March '71.

মাঠে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে 'ডামি' রাইফেল হাতে নিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের কর্মসূচী শুরু হয়। দেশে শোকের ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীনতার পতাকাও উড়তে থাকে।

একটি যুদ্ধের আহ্বান মনেই দেশের ধ্বংস হবে, সহস্র সন্তান হবে পিতৃহারা, স্ত্রী হবে স্বামীহারা, পিতা-মাতা হবে সন্তানহারা, সহস্র পরিবারের দীপ নিভে যাবে; কিন্তু বাঙালি জানে, ক্ষমতালোভী যুদ্ধোন্মাদ পাষাণের কাছে মানবিক মূল্যবোধের আশা করা বাতুলতা মাত্র। পাষাণের পশুশক্তিকে পূর্ব-বঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাত কোটি বাঙালির হয়ে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ৯ই মার্চ, পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়াকে। তিনি আরও বলেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন হইবে পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, অখণ্ড রাখিব না। ...তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব।' বঙ্গবন্ধুর ডাকেও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পূর্ব-বঙ্গের নতুন গভার্ণর জেনারেল টিক্কাকে শপথ করাতে অস্বীকৃতি জানান। টিক্কা শপথ নিতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের সচেতন মানুষও বুঝতে পারে পূর্ব-বঙ্গকে স্বাধীনতা না দেওয়া পর্যন্ত বাঙালি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের জননেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান, ১০ই মার্চ, ঢাকা সফর শেষে করাচিতে ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কোথাও তিনি পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখেননি। পূর্ব-বঙ্গের কার্যত সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ঢাকার সকল সংবাদপত্র, ১৪ই মার্চ, একযোগে 'আর সময় নেই' শীর্ষক একটি যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে– এতে বলা হয় অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত।

> ...while he [Yahya] negotiated with Mujib, his General planned carnage.[5]

১৯৬৫ সালে বেলুচিস্তানে স্থানীয় একটি গোত্রের বিদ্রোহ দমন করতে নিষ্ঠুর টিক্কা পাকিস্তান বিমানবাহিনী ও গোলান্দাজবাহিনী ব্যবহার করে নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বেলুচি বাড়িঘর, ধ্বংস করেছিল জানমাল। পাকিস্তান বাহিনী জানিয়ে দিয়েছিল যে, বিদ্রোহের পরিণতি– পরিবার পরিজনসহ নিশ্চিত মৃত্যু। সে থেকে বেলুচিস্তানীরা বোমরু হিসাবে পরিচিত। এই সে নিষ্ঠুর টিক্কা খান। সে প্ররোচিত করে প্রেসিডেন্টকে– পূর্ব-বঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সামরিক সমাবেশের একান্ত প্রয়োজন। সামরিক জান্তার ক্ষমতালোভী উন্মাদরা সৈন্য ও অস্ত্র আনতে থাকে পাকিস্তান থেকে বাংলায়।[6] কিন্তু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও সময়ের দরকার, তাই শান্তি আলোচনার প্রস্তাব ইয়াহিয়া দেয়। ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকায় এসে, ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে এক রাজনৈতিক বৈঠকে বসে, আড়াই ঘন্টা ব্যাপক চলে, বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া 'তার' যোগে ভুট্টোকে ১৯শে মার্চ ঢাকা আসার আমন্ত্রণ জানায়। ১৭-১৮ই মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, প্রথম দিন এক ঘন্টা ও দ্বিতীয় দিন দেড় ঘন্টা; কিন্তু কোনো সমাধানে সরকার পৌঁছাতে পারেনি। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র এ্যাকশন কমেটি দাবী করে ইয়াহিয়া যেন অতিস্ত্বর পাকিস্তানি সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনে; কিন্তু ইয়াহিয়া শুনেনি। তাই ১৯শে মার্চ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম মোকাবেলা শুরু হয়। সশস্ত্র লড়াই। বাঙালি জনতা বনাম পাকিস্তানি সৈন্য। ঢাকার রাস্তায় হাজার বাঙালির সমারহ। ব্যারিকেড দিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকের গাড়ির যাতায়তের বাঁধা সৃষ্টি। সরকার কারফিউ ডাকে। জনতার পক্ষে প্রচুর হতাহত হলেও জনতা ও সৈন্যের মধ্যে গুলি বিনিময় বন্ধ করা যায়নি। ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে। ২০ই মার্চও দু'ঘন্টা দশ মিনিটের বৈঠক হয় ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবর রহমানের। জুলফিকার আলী ভুট্টো পনের সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দলসহ পশ্চিম-পাকিস্তান ত্যাগ করে ২১ই মার্চ ঢাকায় দেড় ঘন্টার রাজনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ২৩শে মার্চও মুজিবর-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক বসে। বিশ্ববাসী একটি আপোষ ফর্মূলার অপেক্ষায়।

> ...it is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed, that they dragged them out only to buy the time to get enough troops reinforcements over from West Pakistan to launch the attack.[7]

বিশ্ববাসীর চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে টিক্কা পাকসেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে ওঠে। সিংহলপথে পি.আই.এ'র কমার্শিয়াল ফ্লাইটে, শাদা পোশাকের ছদ্মবেশে, সশস্ত্রবাহিনীর লোক বাংলাদেশে আসতে থাকে। সি-১৩০ পরিবহণ বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র ও রসদ আসে, সৈন্যসংখ্যাও দ্বিগুণ করে ষাট হাজারে উন্নীত হয়।

[5] The Guardian, 31 March '71.
[6] The Baltimore Sun, 30 March '71. [...they [Pakistan Army] flew in more troops from West Pakistan.]
[7] The New York Times, 4 April '71.

> ...troops were flowing in daily from West Pakistan and many Bengali began to believe that the negotiations were being deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy reinforcements to the East.[8]

২৩ই মার্চ পাকিস্তান দিবসে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে ৩২নং ধানমণ্ডিতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন; দেশের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। দিনের প্রথম প্রহরেই বাংলার সংগ্রামী জনতা রাজধানীর পথে বেরিয়ে পড়ে, 'আমার সোনার বাংলা'র মাধ্যমে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে; ঢাকা টেলিভিশনও 'আমার সোনার বাংলা' প্রচার করে। ছাত্রলীগের 'জয় বাংলা বাহিনী' আনুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানায়। ২৪ই মার্চ সারাদিন দেশের অবস্থা থমথমে, বাঙালি এক অজানা সংগ্রামে মত্ত। সারাদেশেই আসন্ন মহামুক্তিসংগ্রামের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, সাতক্ষীরা, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহর-গ্রাম-বন্দর-গঞ্জে প্রস্তুতি নেয়। আবারও মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু ফল কিছুই মেলে না। বাঙালি জানে জাতি আজ মহাসংকটে নিপাতিত, একটি বিরাট সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই; তাই চট্টগ্রাম বন্দরে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে 'এম.ভি. সোয়াত' জাহাজযোগে নিয়ে আসা অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে বাঙালি শ্রমিকরা অস্বীকৃতি জানায়, ক্ষিপ্ত পাকবাহিনীর সৈন্য এদের ওপর গুলি চালালে অনেকেই হতাহত হয়।

> ...people asleep in the Bazaar were shot. In the morning the victims were still lying there with rugs on them as if they were still sleeping.[9]

২৫শে মার্চ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যার দিন। এ রাতে মুজিবর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে না-বসে, 'সর্ব প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন'– টিক্কা খানের সঙ্কেতে আশ্বস্ত ইয়াহিয়া চিন্তিত ভুট্টোর হাত ধরে আপোষ অলোচনার ছদ্ম-আবরণ খুলে পি.আই.এ প্লেন যোগে ঢাকা ত্যাগ করে, নির্মমভাবে আঘাতের চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাওয়ার আগে তার বর্বর সৈন্যকে বাঙালির বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার করার নির্দেশ দিয়ে যায়। শুরু হয় টিক্কার সমর অভিযান। ২৫শে মার্চ রাতের আঁধারে ঢাকার ঘুমন্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী পাঁচ ডিভিশন আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈনিক মর্টার-মেশিনগান-ট্যাংকসহ বিভিন্ন মারাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টিক্কার নেতৃত্বে এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটে। একই সঙ্গে পঞ্চাশটি শহর ও দু'হাজার গ্রামে মার্শাল 'ল জারি করা হয়। ছাত্রাবাস, প্রফেসার কোয়াটার্স, পুলিশ ফাঁড়ি, বাজার ও আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে পাইকারীভাবে বাঙালি হত্যা করতে শুরু করে। অসংখ্য বাড়িঘর জ্বালিয়েপুড়িয়ে উজাড় করতে থাকে পাষাণরা। এক কথায়, যেভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে এ শুধু পাকিস্তানি বর্বর ছাড়া আর কোনো মানুষ করতে সক্ষম না। শেখ মুজিবর রহমানকে, ২৫শে মার্চের গভীর রাতের এ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক করা হয়। নিজ বাসভবনে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বলেন, '...from today Bangladesh is independent.' তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানির শেষ সৈনিকটির পরাজয়ের আগ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবেই।' ঢাকার রাজারবাগ ও পীলখানায়, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সৈনিকবাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা যথাক্রমে বাঙালি পুলিশ, ইপিআর ও 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-এর সদস্যকে হত্যা করতে থাকে।

> ...the Army seized control of Dacca on Thursday night and gunfire including heavy artillery was heard till late on Friday morning. Huge fires burnt in the direction of Dacca University.[10]

আকস্মিক বর্বরোচিত আক্রমণের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। টিকিহীন টিক্কার হুকম তামিল করে চলে পাষণা সৈন্যরা, উত্তপ্ত জিঘাংসার সঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গের রাজধানী ঢাকার রাস্তায় সাঁজোয়া বহর ট্যাংকগুলো ধ্বংস করে চলে সামনে পিঁছে যা কিছু পায় সব– মানব বা দালান নির্বিচারে। অনুষ্ণশোণিত-নিঃস্রতায় পাঞ্জাবি পয়মাল সৈনিক মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে হত্যা করে চলে। কারও নিস্তার নেই, একের পর এক লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। বর্বরা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বাঙালির ঘরবাড়িতে, দামী দালান হোক আর বস্তির খুপড়িই হোক– কোনো ভেদাভেদ নেই, সারা শহর যেন রাবনের লঙ্কাপুরী। পাকবাহিনীর এই হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট আর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিলেতের মানুষ স্তব্ধ। বাংলাদেশ একটি নিথর গোরোস্তানে পরিণত হয়েছে।

---

[8] The New Times, 28 March '71.
[9] The Daily Telegraph, 30 March '71.
[10] The Washington Star, 1971.

> 200 Students were killed in Iqbal Hall when their rooms were sprayed with Machinegun fire ... the military removed many of the bodies but the 30 bodies still there could never accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.[11]

২৫শে মার্চের মাঝরাতে আমেরিকার দেওয়া এম-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে। দুস্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দখল করে এবং তাকে প্রধান ঘাঁটি বানিয়ে ছাত্রাবাসগুলোতে গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ইকবাল হলে অবিরাম গুলি নিক্ষেপে ২০০জন ছাত্র নিহত হয়।

> President Yahya Khan's tanks have been ordered into destructive action, no holds barred against the people of East Pakistan; and in grim logic the enemy must be the whole people because they had declared this with rare unanimity for demands of self-rule.[12]

২৬শে মার্চ শুরু হয়– চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশালসহ প্রভৃতি শহরে পাকিস্তানি বর্বরদের নির্বিচার গুলি ছোঁড়ার খেলা। ওরা গুলি চালিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ, নিরস্ত্র ও অসহায় জনগণকে হত্যা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– পাকিস্তানি বর্বরবাহিনী মধুপুরগড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও সাধারণ জনতার প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে ঢাকা থেকে অগ্রসর হয় জামালপুর দখল করার উদ্দেশ্যে। দেওয়ানগঞ্জ থানা শহরেও অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে চিনিকলের বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারীকে হত্যা করেছে। অগণিত ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই। এই বর্বরবাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য যে, যে-কোন নির্মমতার বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহাকে স্তব্ধ করা এবং নির্যাতন ও ধ্বংস করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে হত্যা করা।

> ...on the morning of March 26 ... they [Pakistan Army] went about systematically destroying the entire old city of Dacca. The Army shot every person in the old city and burnt inside their homes. The biggest massacre was in Hindu locality. The Army then rushed to its next target, the Centre of Sheikh Mujib's supporters. The carnage continued till the night.[13]

২৬শে মার্চ সারা দেশে টেলিগ্রাফ যোগে বঙ্গবন্ধুর বার্তা প্রচার করা হয়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে বিদ্রোহী বাঙালি কর্মচারীরা দখল করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি দুপুর ২.১৫ মিনিটে এম.এ.হান্নানের কণ্ঠে প্রচার করা হয়; পরের অধিবেশনে সামরিক বিধিনিষেধ প্রচার হতেই চট্টগ্রাম বেতারকর্মীরা রেডিও-প্রচার বন্ধ করে আগ্রাবাদস্থ বেতার ভবনকে সম্পূর্ণ অকেজো করে বেরিয়ে পড়ে। রাতে হানাদারবাহিনীরা পুরাতন ঢাকা অঞ্চলকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে ওঠেপরে লেগে যায়। অন্যদিকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী আক্রমণের হাতিয়ার জঙ্গী বিমান দিয়ে আক্রমণ করে কর্নেল রবের গ্রামটিকে। বিমানগুলো কয়েকবার হবিগঞ্জের হলদারপুরের আকাশে চক্কর দিয়ে বোমা ফেলতে শুরু করে। দেখতে দেখতে এ গ্রামটি একাত্তুরের হিরোসিমায় পরিণত হয়। পাকসেনাবাহিনীর নির্মম ও সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে ৭২-ঘণ্টা অতিবাহিত হতে থাকে।

২৫/২৬ মার্চের রক্ত ঝড়ানো ঘটনার পর কত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, তবুও কি হত্যাকাণ্ড থামছে? সমানে সমানে চলছে বাঙালি নিধন পর্ব। ঢাকাতে এ আর সীমাবদ্ধ না, সারা দেশ জুড়ে একই অবস্থা– চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশাল প্রভৃতি শহরে পাকিস্তানি বর্বরদল নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ– নিরপরাধী, নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালি হত্যা।

যতদিন যাচ্ছে হত্যাযজ্ঞের তীব্রতা বাড়লেও, পাঞ্জাবি সেনার নিষ্ঠুরতার কমতি না-হলেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কার অবর্ণনীয় আক্রমণের ভয়াবহতার আতঙ্কে বাঙালির চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তিটুকু নদী-ভাঙা জলের মতো বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। সারা দেশ এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র-নিরীহ-শান্তিপ্রিয় বাঙালির ওপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়া,

[11] The Daily Telegraph, 30 March '71.
[12] The New Statesman, 2 April '71.
[13] The Daily Telegraph, 30 March '71.

বর্বর হামলা, সভ্য পৃথিবীতে আর হয়েছে বলে মনে হয় না। নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি মানুষ দস্যুর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের এমন কোনো শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এই বিদেশী বর্বর নির্বিচারী শত্রুর হাত থেকে বাঙালি গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, দেশের সম্পদ বিনষ্ট এবং লুটপাত ও নারী নির্যাতন থেকে মুক্তি পাচ্ছে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর সমস্ত বাঙালি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে চরমভাবে নিপীড়িত হয়ে এসেছে। এই সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির আশা দেখতে পেয়ে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবি সবাই রক্তঝরা সংগ্রামের পথে নেমে পড়েছে। ১৯৭১-এ শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্রহামলা বাঙালির আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করতে পারছে না, বরং শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। বাঙালি যেভাবে পারছে সেভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি আর অসংখ্য তরুণ-তরুণী পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এ জ্ঞানলাভ করছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষের পথে বাংলাদেশের মুক্তি আসা সম্ভব না, বাংলাদেশকে তথা বাংলাকে বাঁচাতে হলে দস্যুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়া করতেই হবে। সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন। প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা– সাধারণ বাঙালি। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি আজ একতাবদ্ধ।

দুই: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

At the All India Muslim League
Working Committee
Lahore session, 23 March 1940

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের মধ্যরাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটে। রক্তপাত, পারস্পরিক ঘৃণা ও ধর্মীয় ছলনাময়ী দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। বাংলাকে বিভক্ত করে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, পাকিস্তান জন্ম নেয়। ভারতবর্ষের বিভাগের ফলে অগণিত মানুষের বাসভূমি বদলে যায়। এক কোটি মানুষ গৃহহারা, পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ নিহিত, বাইশ হাজার নারী ধর্ষিত, দু-লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়। এক রাষ্ট্র ও এক পতাকার প্রতি স্বার্বভৌমত্বের আনুগত্য প্রকাশে পূর্ব-বঙ্গ প্রথম দিন থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসে। পূর্ব-বঙ্গ জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বেশি হলেও রক্তঝরা অতীত জীবন পিছনে ফেলে বাঙালি স্বপ্ন দেখতে থাকে এক স্বনির্ভর রাষ্ট্রের, যেখানে কৃষি ও কুটিরশিল্পের পুনর্বিকাশ ঘটবে। স্বপ্ন দেখতে থাকে গণতন্ত্রচালিত একটি দেশের, সেখানে রাষ্ট্র শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। দুঃখ, কষ্ট ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাঙালি নতুন জীবন শুরু করে। সোহরাওয়ার্দি হবেন পূর্ব-বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী– এ আশা করা স্বাভাবিক পূর্ব-বঙ্গবাসীর; কিন্তু বাস্তবে লিয়াকত আলী খানের যোগসাজসে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না, হলেন নাজিমুদ্দিন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুর্দশার জন্য এ সিদ্ধান্ত চরম দায়ী; এর সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগলিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ব্যবধানও। পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর পূর্ব-বঙ্গের প্রভাব বিস্তর। পাকিস্তানের মোট বাজেটের এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের অংশ হিসাবে পূর্ব-বঙ্গের শতকরা ৭৫ভাগ। পাটশিল্পের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের স্থান সবার উপর। পূর্ব-বঙ্গেই সুতীবস্ত্র প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। গুণমান, বৈচিত্র ও মূল্যের বিচারে পূর্ব-বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো তুলনাই নেই। অতএব পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব-বঙ্গের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই হয়ে দাঁড়ায় একান্ত বাঞ্ছনীয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণপোষণ বন্ধ হওয়ার ফলে জনগণের আর্থিক অবস্থা বলিষ্ঠ হওয়া কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবে এর ফল হয় উল্টো। যে পশ্চিমাংশ মরুভূমি আর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাদপদ; সে পাকিস্তান ক্রমাগত ফুলেফেঁপে, ঐশ্বর্য্য আর বৈভবে ভরে উঠছে। এর পাশাপাশি অগ্রসর পূর্ব-বঙ্গ ক্রমাগত অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু এবং অবহেলিত, বঞ্চিত– সহজ

ভাষায় শোষিত হয়ে আসছে। এ অর্থনৈতিক শীর্ণতা বঞ্চনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জনমনে অসন্তোষ এবং নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। এ আরও অসহায়ক করে তুলে পশ্চিমা প্রভুত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত এবং ষড়যন্ত্রমূলক কতগুলো রাজনৈতিক কার্যক্রম; যেমন ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের পরিষদে যখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী তুলেন তখনই শুরু হয় উর্দ্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র, বাংলার সংস্কৃতিকে গলা টিপে মারার দুরভিসন্ধি, শিল্পোন্নয়নে পূর্ব-বঙ্গের প্রতি বিমাতাসুলভ মনোভাব এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের উপেক্ষা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এই স্বার্থবাদী প্রবনতা পূর্ব-বঙ্গের জনগণের চোখ খুলে দেয়, তারা বুঝতে পারে, পশ্চিমের সংহতি ও ধর্মীয় বন্ধনের গালভরা বুলির আজ কী রূপ! বিরূপ হয়ে উঠে বাংলার মানুষের মন শক্তশালী কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে। শুরু হয় ১৯৪৮-১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি, ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ১৯৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন। এসব আন্দোলনই পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার ভিত্ত নির্মাণ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় চরিত্র ফেডারেল ধরণের, অতএব, ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলো দেশের সামগ্রীক অখণ্ডতা রক্ষা করে নিজ নিজ অঞ্চলে নিজের প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী হবে– এই তো স্বাভাবিক; কেননা আঞ্চলিক সমস্যার মোকাবেলায় সেখানকার জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারই যোগ্যতম; এ সুবিধা বা ক্ষমতাই হচ্ছে স্বায়ত্বশাসন।

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th & 18th of September and 22nd of October, 1939, and the 3rd of February, 1940 on the constitutional issue, this session of the All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October, 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1935, is based will be reconsidered in consultation with various parties, interests and communities in India, Muslims in India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be constituted, with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zones of (British) India should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units should be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Muslims are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the

> constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.
>
> The Session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defense, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary.[14]

২৩শে মার্চ ১৯৪০, লাহোর, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি সৃষ্টি হয়। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা, জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। জিন্নাহ'র সভাপতির ভাষণের পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ সম্মেলনে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবটিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার মূল লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত করে।[15] ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের মূল ভাষ্য ছিল– 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বিবেচিত অভিমত– নিম্নের মূলনীতি ব্যতিরেকে কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থা এদেশে কার্যকর করা সম্ভব না, বা মুসলমানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না, যথা– ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী ইউনিটগুলোকে এক-একটি অঞ্চল হিসাবে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পূনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে মুসলিম অধ্যূষিত এলাকা যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলগুলোকে সংঘবদ্ধ করে এক-একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যায় এবং যেখানে শাসনতন্ত্র হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। এ সমস্ত ইউনিট ও অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত কার্যকর এবং আইনানূগ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখতে হবে যাতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানেও তাদের পরামর্শ সাপেক্ষে তাদের জন্য সংবিধানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।'

লাহোর প্রস্তাব দেয় ভারতীয় মুসলমানকে আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমুহ গঠনের একটি আন্দোলনের সুযোগ। এ প্রস্তাবের ভারতীয় মুসলমানের আবাসভূমি হিসাবে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের গঠন কথা বলে– একটি পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূলভিত্তিই ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতিদান। যে লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্বাধীনতার উপর সৃষ্টি করা হয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ তার প্রতিই প্রদর্শন করে উপেক্ষা। শুধু তাই নয়, স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার মুক্তমনা মানুষকে তারা বিচ্ছিন্নতাদাবী এবং পাকিস্তানের দুষমন বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করে না। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, ১৯৪১ সালের 'সমর পরিষদ'-কে কেন্দ্র করে জিন্নাহ-হক-এর গুরুতর মতানৈক্যের কথা। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের চাপে শেষ পর্যন্ত এ. কে. ফজলুল হক 'সমর পরিষদ' ত্যাগ করতে বাধ্য হন। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম শাসকচক্র এ ধরণের ষড়যন্ত্রের কথা কিভাবে চিন্তা করতে পারে! এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। জবাবও সহজ। পূর্ব-বঙ্গ সম্পদ আর ঐশর্যের দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের একটি পরিচত স্থান। অতএব, এ দেশের প্রতি সবারই লোলুপ দৃষ্টি থাকা অন্যায় না। এ সম্পদই বাংলার এবং বাঙালির ভাগ্যে বারবার দুর্ভোগ টেনে এনেছে। এ বিষয়ে কোনো বির্তকের অবকাশ নেই।

> You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed — that has nothing to do with the business of the State... We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State [...] I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in due course Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.[16]

---

[14] The Lahore Resolution: March 23, 1940 – Lahore.
[15] On 15 April 1941 the Lahore Resolution was incorporated as a creed in the constitution of the All-India Muslim League in its Madras session.
[16] Quaid-e-Azam, Mohd Ali Jinnah's speech on August 11, 1947.

পাকিস্তান গণপরিষদে, ১১ই আগষ্ট ১৯৪৭, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে-ভাষণ দেন তার সুরটি ছিল– 'আমি যে মন্তব্য প্রথম করতে চাই তা হচ্ছে, ... সরকারের প্রথম কর্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যদ্বারা নাগরিকদের জান, মাল, ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হতে পারে। ... দ্বিতীয় বিষয়টি যা আমার মনে উদয় হচ্ছে তা হলো, যে সব অতি বড় বড় অভিশাপের দরুন দেশ দুর্দশা ভোগ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ঘুষ নেয়া ও দুর্নীতি। ... একে আমাদের অবশ্যই দমন করতে হবে লৌহ হস্তে। ... কালোবাজারী হচ্ছে আর একটি অভিশাপ। ... এই সময়ে এই দানবের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। ... পরবর্তী যে বিষয়টি আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো স্বজন পোষণ এবং দালালী। ... এই পাপকে ধ্বংস করতে হবে নির্মমভাবে। ... এখন আমরা কি করব? যদি আমরা মহান রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে চাই, আমাদের সম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে হবে জনসাধারণ বিশেষতঃ গরীবদের মঙ্গলসাধনের জন্য। ... ক্রমে ক্রমে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সমস্ত জটিলতা অন্তর্হিত হবে। বস্তত যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলবো, এ হচ্ছে মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, এগুলি না থাকলে আমরা বহু পূর্ব হতে থাকতে পারতাম একটি স্বাধীন জাতি। সকলের স্মরণ রাখতে হবে একটি শিক্ষা– আপনারা স্বাধীন, আপনাদের স্বাধীনতা রয়েছে আপনাদের মসজিদে মন্দিরে যাওয়ার অথবা আপনাদের সম্মুখে কোন বাধা নেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্য কোন ভজনালয়ে যাবার। আপনি যে কোন ধর্ম কিংবা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তার কোন সম্পর্ক নেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সাথে। ... এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে, এমন এক সময় আসবে, যেদিন হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে অবশ্য নয়, কারণ তা হলো প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস তা হবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক অর্থে।'

ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানকে একটি উন্নত বুর্জোয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন জিন্নাহ, কিন্তু এ-সুযোগকে বাস্তবে পরিণত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জিন্নাহর চিন্তা ছিল অবাস্তব, নিছক আদর্শ মাত্র। ধৈর্যের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা বা সদিচ্ছামূলক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার উৎসাহ ছিল না। পাকিস্তানকে শোষণমুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো স্থিরচিন্তা ছিল না। জাতির পিতাসুলভ প্রাণশক্তিরও অভাব ছিল। তাঁর পরিচালন পদ্ধতি ছিল বটতলার মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উপরতলার মানুষের আদেশ অনুসরণ করে চলা, এর সঙ্গে তার কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ে যায় এক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে। তাই জিন্নাহ মৃত্যুর (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) পর পরই পাকিস্তানে সৃষ্টি হয় অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা; গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে সামরিক অফিসারদের কল্পরাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক অফিসার সারাদেশে সামরিক আইন জারি করে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ২৪শে অক্টোবর এক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন আইয়ুব খানকে; কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! ২৭শে অক্টোবর রাতের অন্ধকারে ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয় আইয়ুব খান। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইস্কান্দার মির্জা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শক্তিশালী রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভাবে আইয়ুব খান নিজেকে প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই আইয়ুব তার ক্ষমতাদখলকে 'অক্টোবর বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত করে। ২৭ই অক্টোবর দিনটি, জনগণের সম্মতি ছাড়াই, 'অক্টোবর বিপ্লব' হিসাবে পালন করার সুব্যবস্থা করে। আইয়ুব খান চতুর রাজনীতিবিদ ছিল, তাই প্রথম সুযোগেই রাজনীতিক দলগুলোর প্রতি আক্রমণ শুরু করে। রাজনীতিক দলগুলোর কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুটি আদেশ জারি করে (৭ই আগস্ট ১৯৫৯)– ১. পোডো[17], এবং, ২. এবডো[18]। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুবের নিজস্ব চিন্তাধারায় পরিকল্পিত 'মৌলিক গণতন্ত্র'[19] পদ্ধতির আওতায় 'প্রথম নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হয়।

> The Basic Democracies system was set up as five-tiers institutions. Tier one was composed of union councils, one each for groups of villages having an approximate total population of 10,000. Each union council comprised ten directly elected members and five appointed members. Union councils were responsible for local agricultural and community development and for rural law and order maintenance; they were empowered to impose local taxes for local projects. Tier two: consisted of the *tehsil* (subdistrict) councils, which performed coordination functions. Tier three: the district (*zilla*) councils were composed of nominated official and non-official members, including the chairmen of union councils. The deputy commissioners chaired this body. The district

[17] Public Officers Disqualification Order (PODO).
[18] Elective Bodies Disqualification Order (EBDO).
[19] Basic Democracies

> councils were assigned both compulsory and optional functions pertaining to education, sanitation, local culture, and social welfare. Tier four: the divisional advisory councils coordinated the activities with representatives of government departments. Tier five: consisted of one development advisory council for each province and chaired by the governor who was appointed by the president.[20]

তিন বছরের মাথায় আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা ঘটে; রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দেশের বিরুদ্ধে দুনীর্ত ও স্বজপ্রীতির কারণে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব-বঙ্গে সর্বপ্রথম আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ২৪শে জানুয়ারি ১৯৬২ সালে পূর্ব-বঙ্গ[২১] ছাত্রলীগ ও পূর্ব-বঙ্গ[২২] ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে, গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে দল নির্বিশেষে, প্রণয়ন করে আইয়ুব-সামরিক-শাসন-বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী। এর এক সপ্তাহ পরেই নিরাপত্তা আইনের আওতায়, বিদেশী অর্থানুকূল্যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করে সোহরাওয়ার্দীকে করাচিতে আটক করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি আইয়ুব যখন ঢাকায় আসে তখন ছাত্র-জনসাধারণ সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সামরিক-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রতিবাদ করতে রাজপথে নেমে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। সামরিক আইনের প্রতি ভ্রূকুটি করে প্রকাশ্যে রাজপথে মিছিল হয়। ‘নিপাত যাক আইয়ুব খান’ ও ‘নিপাত যাক সামরিক শাসন’– এরকম দেয়াল-লিখনিতে ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। পরের দিন ছাত্রমহল সরকারী পত্রিকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে; গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো খবর প্রকাশ না করায়। ৭ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা আইয়ুবকে ঘেরাও করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। আইয়ুব তখন জন-নিরাপত্তা আইনের বলে গণ-আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে; নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে। মার্চে আইয়ুব খান তার পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল– জনগণের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো অধিকার নেই, মেললিক গণতন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। আর করাচি থেকে পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তর করে ইসলামাবাদে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বাংলার পাটে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পশ্চিমা গড়ছে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আর বাংলার জনগণের নেই মাথা গুঁজার কোনো ঠাঁই। বাংলার জনগণের রক্তে পরিশোধ্য বৈদেশিক ঋণে পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট এলাকার লবণাক্ততা দুর হয়, মঙ্গলা তারবেলা এবং গোলাম মোহাম্মদ বাঁধ তৈরি হয়; কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার জনগণ যখনই দাবী তুলছে তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে অর্থের টান পড়ে। বাংলার কৃষক ও জনগণের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থে প্রতিপালিত হচ্ছে বিরাট সেনাবাহিনী। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত– যদিও পাকিস্তানের মানুষের শতকরা ছাপান্নজনের বাসভূমি পূর্ব-বঙ্গ; তবুও এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না দেশরক্ষা বাহিনীর কোনো একটি সদর দপ্তর। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী এবং দ্রব্য মূল্যের তারতম্যে কল্পনাতীতভাবে বৈষম্য বিরাজ করছে দু’অংশের মধ্যে।

স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব-বঙ্গের মানুষ আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায়নি; তাই শুরু হয় আন্দোলন; এর দাবীগুলো ছিল– নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়া। সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষাসঙ্কোচন নীতি পরিহার, তিন বছরের স্নাতক কোর্স বাতিল ও সোহরাওয়ার্দির মুক্তির দাবিতে আন্দোলন সারা পূর্ব-বঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন চলে সোহরাওয়ার্দি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত (১০ই সেপ্টেম্বর)। ধীরে ধীরে যখন আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে তখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, ১৯৬৪ সালে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বুনতে শুরু করে। প্রথমে হিন্দু-মুসলিম পরে বিহারী-বাঙালি দাঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র, বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকরা এ ভয়াবহ দাঙ্গাকে থামাতে গিয়ে একটি ‘দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি’ গড়ে তুলেন। এ কমিটির উদ্যোগে ‘পূর্ব-পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’ শিরোনামে একটি প্রচারপত্র ছাপা হয়; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের গভর্ণর মোনায়েম খান এ প্রচারপত্রের জন্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে স্বৈরাচারীশাসক আইয়ুব খানের দোসর মোনায়েম খানের, আচার্য হিসাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে বাধে ছাত্র-পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ; যা পরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সরকার গায়ের জোরে পূর্ব-বঙ্গের ৭৪টি কলেজ ও ১৪০০টি হাইস্কুল বন্ধ আর ১২০০জন ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পাকিস্তান সরকার ‘আজাদ’, ‘সংবাদ’ ও ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকাগুলোকে মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করে; কারণ, তারা আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের খরব ছাপিয়ে ছিল।

> The second Indo-Pakistani conflict (1965) was also fought over Kashmir and started without a formal declaration of war. The war began in August 5, 1965 and was ended Sept 22, 1965. The war was initiated by Pakistan

[20] A. R. Choudhury.
[২১] পূর্ব-পাকিস্তান।
[২২] পূর্ব-পাকিস্তান।

> who since the defeat of India by China in 1962 had come to believe that Indian military would be unable or unwilling to defend against a quick military campaign in Kashmir, and because the Pakistani government was becoming increasingly alarmed by Indian efforts to integrate Kashmir within India. There was also a perception that there was widespread popular support within for Pakistani rule and that the Kashmiri people were disatisfied with Indian rule.[23]

বৈষম্য এবং রাজনৈতিক পীড়নে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস তপ্ত, তখন (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সাল) ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। কাশ্মির সমস্যা নিয়ে পুনরায় শুরু হয়। শত্রুতামূলক অভিযান ও পাল্টা অভিযান। ১৭দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায়, তাশখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতের সঙ্গে আপস মীমাংসায় পৌঁছে; কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলাফলে পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনীতিকদের মধ্যে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আর এ যুদ্ধই পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বিপদকালে কি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তার নগ্নরূপ প্রকাশ করে বাঙালির সামনে।

পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, প্রকাশ্যেই রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০ই জুন ১৯৬৭ সালে সরকারী দলের নেতা সবুর খান রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়লা বৈশাখ পালন ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা ইসলামবিরোধী কাজ বলে আখ্যায়িত করে। ২২শে জুন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করে। এর প্রতিবাদে ডাকসু ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদসভা ও মিছিল করে। প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও দেশের অন্যান্য জায়গাতে সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এরকম প্রতিবাদের মুখে ১৯৬৭ সালের ৪ঠা জুলাই তথ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে।

পূর্ব-বঙ্গবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কি করুণ এবং বিভীষিকাময় সে-রূপ; এ কল্পনা করা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অন্যদিকে এ অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাবে না; মাথার উপর ঝুলানো হয়েছে দেশরক্ষা আইনের খড়্গ। কোনো কথা বললেই বিনাবিচারে আটক এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাসের সুব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সমস্ত দেশ এ নির্যাতনমূলক আইনের আওতায় স্তব্ধ থাকলেও একটি কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সে কণ্ঠ, শত বাঙালির এক কণ্ঠ, মুজিব কণ্ঠ। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনে পূর্ব-বঙ্গ[২৪] আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা দাবী পেশ করেন–

১. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম;
২. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এ ক-টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ;
৩. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব-বঙ্গের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে;
৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, করধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো করধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসসূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে;
৫. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রফতানী করার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে;
৬. পূর্ব-বঙ্গকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব-বঙ্গে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

---

[23] A. R. Choudhury.
[২৪] পূর্ব-পাকিস্তান।

স্বাধীনতা উত্তরকালে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সৃষ্ট বৈষম্যের পাহাড় ভেঙে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতিকে মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বায়ত্তশাসনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হয় ছয়দফা কর্মসূচী। ছয়দফা আইয়ুবি স্বৈরতন্ত্র বন্ধ করে অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলে; এতে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মনে নতুন এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে। বাংলার জনগণ একবাক্যে ছয়দফাকে বাংলার শোষণমুক্তির এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার সনদ বলে গ্রহণ করে; কিন্তু পশ্চিমা শাসকচক্র তা মেনে নিতে অস্বীকার করে; বরং তারা শেখ মুজিবর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয় পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দলগুলোও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে; আওয়ামী লীগের নীতিকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে প্রচার করে। সত্য ও নায্য দাবীর কারণে মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের উপর নেমে আসে জুলুম-অত্যাচার-জেল-নির্যাতন। মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে সাজানো হতে থাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৩ই মে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়।

৭ই জুন ১৯৬৬ সালে ছয়দফার সমর্থনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বঙ্গে হরতাল ডাকে; সর্বত্র কলখারখানা বন্ধ ও নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। হরতাল চলাকালীন একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়; এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছয়দফা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব-বঙ্গের ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছয়দফা বিশেষ সাড়া জাগায়। জনগণের স্বৎস্ফূর্ত হরতালে আইয়ুব খান অন্য কোনো পথ না পেয়ে অস্ত্রের ভাষাপ্রয়োগে এবং গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ছয়দফার মোকাবেলা করার হুঙ্কার দেয়। উচ্চারণ করে, 'অশুভ প্রচেষ্টা মোকাবেলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।' চালায় নির্বিচারে অত্যাচারের স্টিমরোলার, পুলিশ ও ই.পি.আর বাহিনী বেপরোয়া ভাবে গুলি চালায় জনতার উপর, এতে অনেক বাঙালি প্রাণ হারায়। দেশের নেতাসহ শীর্ষস্থানীয় সব রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ ও স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাকে। বাজেয়াফত করা হয় ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পত্তি।

এ-এক অবিশ্বাস্য এবং নাটকীয় ঘটনা; কিন্তু এত করেও ছয়দফার সঞ্জীবনী আবেদনকে ম্লান করা বা দমানো সম্ভব হয়নি। অতএব আইয়ুব ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে খুলনার এক জনসভায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে প্রকাশ্যে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে। শুরু হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', বঙ্গবন্ধু এক নম্বর আসামী, সঙ্গে আরও ৩৪জন অভিযুক্ত। ১১জনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, রাজসাক্ষী হওয়ার কারণে। ছয়দফাকে নস্যাৎ করাই ছিল এ মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯শে জুন ১৯৬৮ থেকে চাঞ্চল্যকর এ সাজানো তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচার কাজ শুরু হয়। কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার ভেতর এ প্রহসনমূলক মামলার শুনানিতে দেশীবিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত হন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভাবে বাংলার বুকে আর কেউ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলার থাকবে না; বাস্তবে ফল হয় উল্টো। আইয়ুব ও মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বাংলার অধিকার সচেতনজাগ্রত বীরজনতা। বাঙালি জনতার হুঙ্কারে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠে, 'আইয়ুব গদিতে আগুন ধরাও'। থরথর করে কেঁপে উঠে আইয়ুব-মোনায়েমের তখতে তাউস। আইয়ুব চমকে উঠে, নিমজ্জমান তরী রক্ষার ব্যাপৃতিতে নিয়োজিত হয়। বাঙালির উপর নেমে আসে আইয়ুবের আবারও স্টিমরোলার এবং অমানুষিক নির্যাতন। সৃষ্টি হয় উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য ও মুজিবর রহমানের ছয়দফা দাবীর সমর্থনে সর্বদলীয় 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' নিজস্ব দাবী দেয় 'এগার-দফা'।

১. আত্মনির্ভরশীল কলেজগুলোকে প্রাদেশিক-করণ নীতি প্রত্যাহার করে জগন্নাথ কলেজকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব, মাতৃ"ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, কলেজে নৈশিভিভাগ খোলা, শিক্ষকদের বাক-স্বাধীনতা প্রদান, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যারয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের বেতনহ্রাস, ছাত্রবাসে উন্নমানের খাওয়ার ব্যবস্থা, চাকরিতে নিশ্চয়তা দান, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রর্বতন।
৩. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসন ও একটি সাবফেডারেশন গঠন।
৫. ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, পাটের ব্যবসা ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।
৬. কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হারহ্রাস।
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বোনাস, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার।
৮. পূর্ব-বঙ্গে[২৫] বন্যায়-নিয়ন্ত্রণ এবং জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।
৯. জরুরি অবস্থা, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।

[২৫] পূর্ব-পাকিস্তানে।

১০. সামরিক চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ।
১১. যাবতীয় রজুন্দিদের মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

'এগার-দফা' দাবীতে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৯ থেকে ছাত্রসমাজ আন্দোলন শুরু করে। অন্যদিকে বাঙালির উপর পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে আইয়ুবি নির্যাতন। শুরু হয় ১৪৪ধারা জারি, বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশের গুলি, বাঙালির উপর নির্যাতন, গ্রেফতার আর হত্যা। মওলানা ভাসানীও ১৪৪ধারা ভাঙতে নামাজ পড়তে নেমে পরেন ঢাকার মহাসড়কে। আইয়ুব এ আন্দোলনের কারণে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, বঙ্গবন্ধু কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনী থেকে বেরিয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লাখ মানুষের সমাবেশে ঘোষণা করেন, 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই।'

স্বঘোষিত 'ফিল্ড মার্শাল' আইয়ুব বাংলার গণ-বিক্ষোভকে দমন করতে না পেরে বা গুলি চালিয়ে বাংলার জনতার এ-দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে অক্ষম হয়ে, ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ গদি ত্যাগ করে। ক্ষমতা প্রদান করা হয় একই পোশাক পরা সামরিক কর্তা ইয়াহিয়ার কাছে। পাকিস্তানে আবারও সামরিক আইন জারি হয়; এটা নতুন বোতলে পুরাতন মদ রাখার প্রয়াস যেন। উদ্দেশ্য ইয়াহিয়াকে দিয়ে কোনোরকমে পূর্ব-বঙ্গের উপর শাসনশোষণ অব্যাহত রাখা; বা অব্যাহত রাখা যায় কি না তা যাচাই করে দেখা। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয় ইয়াহিয়া; কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেই যে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে এমন কথা তো পশ্চিম-পাকিস্তানির অভিধানে নেই। নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয় ৫ই অক্টোবর '৭০; কিন্তু ১২ই নভেম্বরের ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে একে পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচীকে নির্বাচনী মেনিফেস্টোরূপে জনগণের কাছে তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধ বলেন, 'যদি আপনারা বাংলার শোষণ মুক্তি চান, যদি পাকিস্তানের নাগরিকত্বের সমান মর্যাদা চান, ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চান; তবে আমার দলের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিন।'

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বের সকল নির্বাচনী রেকর্ডকে ম্লান করে একবাক্যে বঙ্গবন্ধুকে মনোনীত করে। ইসলামাবাদের এবং লারকানার শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল বাড়িতে বসে সোমরসে আমোদিত ইয়াহিয়া-ভুট্টো আঁতকে উঠে। রাজনৈতিক নেশা বুদবুদের মত বিলিন হয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের খেলা। ঠিক করা হয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া যাবে না। আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা যাওয়া মানেই বাঙালির প্রভুত্ব স্বীকার করে নেওয়া। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে আর শোষণ করা সম্ভবপর হবে না। শুরু করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপরীতে সামরিক বাহিনীর নিরস্ত্র মানুষের হত্যাযজ্ঞ। দেশ-রক্ষার অজুহাতে দেশ-ভাঙার খেলা শুরু করে পাকিস্তান সমর বাহিনী। ষড়যন্ত্রের পরিণতি হিসাবে ২৫শে মার্চ '৭১-এর রাতের অন্ধকারে যা শুরু হয় তার ব্যাপকতা, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত বিশ্ববাসীর অজানা না। সচেতন বাঙালি হয়ে ওঠে অস্থির ও বিক্ষুদ্ধ। রাষ্ট্রের ভিত কেঁপে ওঠে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জাতীয়-অস্তিত্ব ধরে রাখার তাগিতে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছে, ধরেছে অস্ত্র।

জয় বাংলাদেশ। মুক্ত বাংলাদেশ।

[মূল খসড়া: ১৯৭১, লন্ডন।]